বাস্তুতন্ত্র ও স্থিতিশীল উন্নয়ন: বৈদিক এবং বৌদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি বিচারমূলক বিশ্লেষণ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য

উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক সমর কুমার মণ্ডল

গবেষক

উৎসব রায়

দর্শন বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা ৭০০০৩২

মার্চ ২০২৩

বাস্তুতন্ত্র ও স্থিতিশীল উন্নয়ন: বৈদিক এবং বৌদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি বিচারমূলক বিশ্লেষণ

বর্তমানে এমন কথা খুবই প্রচলিত যে মানুষ বাস্তুতন্ত্রকে প্রভাবিত করে। মানুষ তার জ্ঞানের আলোকে, সভ্যতার অগ্রগতিকে কাজে লাগিয়ে উন্নয়নের ধারা বজায় রাখতে চারপাশের পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি করছে। তাছাড়া মানুষ নিজের স্বার্থে পরিবেশকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করার ফলে বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। মানুষ তার উন্নয়নের ধারায় প্রকৃতিকে জয় করার চেষ্টা করলেও প্রকৃতির কাছে আজও সে শিশু। প্রকৃতির ধ্বংসাত্মক তান্ডবকে মানুষ বহু চেষ্টা করেও আজও জয় করতে পারে নি। এর প্রমাণ তুরস্ক ও সিরিয়ায় ঘটা সাম্প্রতিক ভূমিকম্প থেকে স্পষ্ট। এখানেও মানুষের এই মৃত্যুমিছিলের কারণ যে মানুষেরই লোভ- সে কথা আজ প্রমাণিত। তুরস্ক-সিরিয়া সীমান্ত বিশ্বের অন্যতম একটি সক্রিয় ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা বলে পরিচিত। অতীতেও এই অঞ্চল ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের সাক্ষী হয়েছে। এই সবকিছু জানা সত্ত্বেও মানুষ উন্নয়নের নামে গগনচুম্বী ইমারত এসব অঞ্চলে প্রস্তুত করেছে। সাম্প্রতিককালে নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে একের পর এক বহুতল নির্মিত হয়েছে। তুরস্কে ১৯৯৯ সালের ভূমিকম্পে প্রায় ১৭০০০ মানুষের মৃত্যুর পরে গৃহনির্মাণ সংক্রান্ত বিশেষ নিয়ম-কানুন এখানে বলবৎ করা হয়।[1] কিন্তু সরকারি বিধিকে মান্যতা না দিয়ে মানুষ নিজের স্বার্থে এসব অঞ্চলে বহুতল নির্মাণ করেছে। এই সবকিছুর কারণ মানুষের তথাকথিত উন্নয়নের বাসনা। আরো স্পষ্ট করে বললে মানুষের লোভ পক্ষান্তরে তার নিজেরই বিপদ ডেকে এনেছে। কেবল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নয়,

[1] মৃত্যু ৬৩০০ পার, বন্ধু ভারত দু'দেশের পাশে. (২০২৩, ফেব্রুয়ারি ০৮). *আনন্দবাজার পত্রিকা*, পৃ. ১.

ভারতেও পরিবেশের ক্ষতি করে মানুষের তথাকথিত উন্নয়নের যাত্রা অব্যাহত রাখার নজির দেখতে পাওয়া যায়। এর অন্যতম প্রমাণ, জোশীমঠের সাম্প্রতিককালের ভূমিধ্বস থেকে স্পষ্ট। ১৯৭৬ সালেই 'মিশ্র কমিটি'র তরফে জানানো হয় জোশীমঠ শহরে কোন বড়ো নির্মাণকাজ করা যাবেনা।[2] প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনা থাকায় গাছ না-কাটা, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বন্ধ রাখার কথা বলা হয়। কিন্তু যাবতীয় সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে পাহাড় কেটে রাস্তা তৈরি, বহুতল নির্মাণ, একাধিক জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ জোশীমঠে চলেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, তথাকথিত উন্নয়নের জোয়ারে ভাসতে গিয়ে নিজেদের লোভের মাশুল আজ জোশীমঠকে দিতে হচ্ছে। শুধু জোশীমঠের ভূমিধ্বস নয়, উত্তরাখন্ডের গাড়োয়ালের পাহাড়ে টানা নগরায়ণ ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ভবিষ্যতে কী ধরণের বিপদ ডেকে আনবে, তা এখন অনেকের কাছে স্পষ্ট। এখনও সিকিম জুড়ে তিস্তা নদীতে মানুষ নিজের প্রয়োজন মেটাতে একের পর এক জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়িত করছে। এছাড়া এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় যেখানে মানুষের তথাকথিত উন্নয়নকে বাস্তবায়িত করতে গিয়ে মানুষ নিজের তথা সমগ্র পরিবেশের বিপর্যয় ডেকে আনছে। এইসব পরিবেশগত সমস্যা অনেক আগে থেকেই আমাকে ভাবিয়েছে এবং এই ধরনের ‘বাস্তব সমস্যা সংক্রান্ত’ বিষয়কে নিজের গবেষণার ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিতে প্রেরণা জুগিয়েছে। এই পরিবেশ বিষয়ক বাস্তব সমস্যাকে দূর করতে গেলে দার্শনিক আলোচনার প্রয়োজন। Aldo Leopold পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যাকে দার্শনিক সমস্যা বলেন। বাস্তুতন্ত্র (Ecology) হলো পৃথিবীতে বসবাসকারী জীবকূলের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ক এবং পরিবেশের সঙ্গে তাদের সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত

[2]জোশীমঠ ধসছে, রাত জেগে মানুষ. (২০২৩, জানুয়ারি ০৮). *আনন্দবাজার পত্রিকা*, পৃ. ১.

আলোচনা। আমেরিকান পরিবেশবিদ তথা দার্শনিক Aldo Leopold স্পষ্টভাবে বাস্তুতন্ত্রকে (Ecology) নীতিবিদ্যার ধারণার সঙ্গে যুক্ত করেছেন।[3]

নরওয়ের দার্শনিক Arne Naess 'বাস্তুতন্ত্র' সম্পর্কিত নৈতিক আলোচনা প্রসঙ্গে অগভীর বাস্তুতন্ত্র (Shallow Ecology) ও গভীর বাস্তুতন্ত্র (Deep Ecology) এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য পার্থক্য করেছেন। অগভীর বাস্তুতন্ত্রে মানবকেন্দ্রিকতা প্রাধান্য পেয়েছে, তাই মানুষের প্রয়োজনের ক্ষেত্র হিসাবে পরিবেশের গুরুত্ব। এখানে পরিবেশ রক্ষার চিন্তাধারা একান্তই মানুষের প্রয়োজনের খাতিরে। প্রকৃতির স্বতঃমূল্য এই দৃষ্টিভঙ্গিতে অস্বীকৃতিলাভের কারণে তা পরিবেশ সংরক্ষণে যথেষ্ট ভূমিকা গ্রহণে ব্যর্থ।

অগভীর বাস্তুতন্ত্র অনুসারে মানুষ সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করেছে এবং মানুষের প্রয়োজনে পরিবেশ গুরুত্ব লাভ করেছে। এই মতের সমর্থকরা মানুষের জন্য পরিবেশকে রক্ষা করতে চায়। এনারা মানুষের স্বার্থচিন্তা করেই বলেন যে, পরিবেশ তথা বাস্তুতন্ত্রের রক্ষা করা উচিত, কারণ তা মানুষের জন্য মূল্যবান। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি খুবই আত্মকেন্দ্রিক। এই দৃষ্টিভঙ্গি কখনোই পরিবেশের অবক্ষয় বা ধ্বংস রোধ করতে পারে না। কারণ এখানে প্রকৃতি স্বতঃমূল্যবান নয়।

গভীর বাস্তুতন্ত্রের অন্যতম সমর্থক Arne Neass ও George Sessions মনে করেন এই জগতে মানুষ, মনুষ্যেতর সকল প্রাণী, উদ্ভিদসমূহ পরিবেশের সব কিছু স্বতঃমূল্যবান এবং তাদের বিকাশও সমানভাবে কাম্য। এখানে মানুষের স্বার্থকে নৈতিক

[3] Leopold, Aldo. (1949). The Land Ethics. *A Sand County Almanac*. Page- 201-226.

বিচারের মানদণ্ডরূপে গণ্য করা হয় না। বর্তমানে মানুষ তার চারপাশের পরিবেশ ও অন্যান্য মনুষ্যেতর প্রাণীকে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এত পরিমাণে ধ্বংস করছে যে উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণীর সংখ্যা প্রতিনিয়ত হ্রাস পাচ্ছে। কিন্তু মানুষ যখন নিজেকে বিশ্বের সকল অংশের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে উপলব্ধি করবে, এবং নিজেকে সহ জগতের সকল উপাদানকে এক বিশাল সমগ্রের অংশ বলে মনে করবে তখনই পরিবেশগত সঙ্কট দূর করা সম্ভব হতে পারে বলে মনে হয়।

অগভীর বাস্তুতন্ত্রে প্রকৃতির সবকিছুর উর্দ্ধে মানুষকে প্রধান্য দেওয়া হয়েছে। মানুষের প্রয়োজনে পরিবেশকে রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। পরিবেশের স্বতঃমূল্য স্বীকার না করার ফলে এই দৃষ্টিভঙ্গিটি ত্রুটিপূর্ণ। অন্যদিকে গভীর বাস্তুতন্ত্রের ধারণাটিও সমালোচনার উর্দ্ধে নয়। উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে এই ধারণাটি কতটা কার্যকরী সেই প্রশ্ন যেমন আছে; তেমনি গভীর বাস্তুতন্ত্র অনুসারে মানুষ নিজের স্বার্থপূরণের জন্য প্রকৃতি ও পরিবেশের অন্যান্য প্রাণীর ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। কিন্তু এমনভাবে মানবসভ্যতার অগ্রগতি বা উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে। কৃষিকাজ, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, নগরায়ণ প্রভৃতি মনুষ্যসৃষ্ট যেকোন পরিবর্তনেই প্রকৃতির ক্ষতিকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু মানুষ যদি প্রকৃতি ও অন্যান্য প্রাণীর ক্ষতির জন্য এসব কাজ করা থেকে বিরত হয়; তবে মানুষ পুনরায় গুহাবাসী জীবনে পৌঁছে যাবে, যা কখনও কাম্য হতে পারে না।

তাই আমাদের এমন একটি বিকল্প পথ বা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসন্ধান করা প্রয়োজন, যা একদিকে প্রকৃতি ও প্রাণীর ধ্বংসকে রোধ করবে; আবার অন্যদিকে

মানুষের উন্নয়নের যাত্রাও অব্যাহত থাকবে। আমার গবেষণার মূল প্রশ্নটি হলো- কীভাবে আমরা একত্রে পরিবেশের অবক্ষয় রোধ করতে এবং উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে পারবো? এই প্রসঙ্গে আমরা অবশ্যই বোঝার চেষ্টা করবো 'উন্নয়ন' বলতে আমরা সাধারণভাবে যা বুঝি তা 'প্রকৃত উন্নয়ন' কিনা।

উপরে উত্থাপিত প্রশ্নকে মাথায় রেখে আমার অভিসন্দর্ভটি- 'বাস্তুতন্ত্র ও স্থিতিশীল উন্নয়ন: বৈদিক এবং বৌদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি বিচারমূলক বিশ্লেষণ'- এই পাঁচটি অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে। এই অধ্যায়গুলি হলো- (১) পরিবেশ সম্পর্কে বৈদিক দৃষ্টিভঙ্গি (২) পরিবেশ সম্পর্কে পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি (৩) বাস্তুতন্ত্রের প্রেক্ষাপটে পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা (৪) পরিবেশ সম্পর্কে বৌদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি (৫) উন্নয়ন ও স্থিতিশীল উন্নয়ন এবং মূল্যায়ণ ও সিদ্ধান্ত।

অভিসন্দর্ভের ভূমিকা অংশে পরিবেশ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমানে প্রত্যক্ষভাবে যেসব পরিবেশজনিত সঙ্কট সর্বাধিক বৃদ্ধি পাচ্ছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল অ্যাসিড বৃষ্টি, ভূগর্ভে বিশুদ্ধ জলের অনুপস্থিতি, নদী-জল-সমুদ্রে জলদূষণ, বায়ুদূষণ, ভূমিকম্প প্রভৃতিকে এখানে তুলে ধরা হয়েছে। প্রকৃতির সৃজনশীল এবং নান্দনিক মূল্যও অপরিসীম। প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে বহু ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ; যেমন- খনিজ দ্রব্য, মূল্যবান উদ্ভিদ ইত্যাদি। তাই প্রকৃতির অর্থনৈতিক গুরুত্বও অপরিসীম। সুতরাং, প্রকৃতির ক্ষতি অর্থনৈতিক দিক থেকেও সঙ্কটজনক। তাই বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন মানবজাতির পরিবেশ রক্ষায় মনোনিবেশ করা বাঞ্ছনীয়। বর্তমানে মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের সমস্যার পাশাপাশি এক নতুন সমস্যা হল পরিবেশ সমস্যা। মানুষ প্রতিনিয়ত নিজের

ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য পরিবেশের অপূরণীয় ক্ষতি করে চলেছে। এরফলে পরিবেশের সঙ্গে মানুষের আর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নেই বরং সেই সম্পর্ক সংঘাত ও দ্বন্দ্বের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এছাড়া এই অংশে পরিবেশের সংজ্ঞা, পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান, 'Environment' শব্দের অর্থ প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে।

প্রথম আধ্যায়ে পরিবেশ সম্পর্কে বৈদিক দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করা হয়েছে। বেদ এমন এক শাস্ত্র যার দ্বারা আমরা সেইসব বিষয়ের জ্ঞানলাভ করি, যার জ্ঞান আমরা সাক্ষাৎভাবে ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার দ্বারা পেতে পারি না। পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ঋগ্বেদের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। সুখ-সমৃদ্ধির জন্য প্রত্যহ বৃক্ষরোপণের কথা ঋগ্বেদে বহু হাজার বছর পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া ঋগ্বেদে আত্মীয়, অনাত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব, প্রিয়জন এমনকি প্রাণীদেরও সম অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। কাজেই অন্যকে বঞ্চিত করে যে ব্যক্তি নিজ ভোগ-বিলাসে আচ্ছন্ন হয়, সেই কর্মকে সর্বদা পাপের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। জীবনের বিচিত্র ক্ষেত্রে প্রাণের প্রকাশে এবং বাস্তুতন্ত্রে জলের ভূমিকার প্রসঙ্গ সামবেদের বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত হয়েছে। সামের আশ্রয় স্বর, স্বরের আশ্রয় প্রাণ, প্রাণের আশ্রয় অন্ন এবং অন্নের আশ্রয় জল। আধুনিক পরিবেশবিদদের ভাষায় জল হলো জীবনের অমৃতস্বরূপ। সামবেদের একাধিক স্থানে জল, বৃষ্টি প্রভৃতি প্রকৃতির একাধিক উপাদানের বর্ণণা দ্বারা প্রকৃতির প্রতি বৈদিক ঋষিদের সজাগ দৃষ্টি প্রকাশিত হয়েছে। যজুঃ বেদে বলা আছে, বৃক্ষ-ছেদন এবং পরিবেশ দূষণ সম্পূর্ণ বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি করে, তাছাড়া এখানে প্রাণীহত্যাকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে, কারণ প্রাণীরা সমাজের উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তাই যেসব প্রাণীরা কৃষিক্ষেত্রে আমাদের বিশেষ সহায়ক, যেমন- গরু, বলদ প্রভৃতি প্রাণীর হত্যা থেকে

রাজাকেও বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। অথর্ববেদে ঋতকে সত্যের সঙ্গে এবং সত্যকে ধর্মের সঙ্গে একাত্ম করে বোঝানো হয়েছে। নৈতিক দিক দিয়ে সত্য সকল কিছুকে নির্দিষ্ট নিয়মে ঘটায়, অন্যদিকে ধর্মও হল তা যা সকল কিছুকে ধারণ করে। ঋতকে নৈতিক নিয়মের রক্ষক বলা হয়। অর্থবেদে প্রকৃতির সকল উপাদানের স্বগতমূল্য স্বীকৃত হয়েছে। আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে অথর্ববেদে পৃথিবীসূক্তে ধরিত্রী-মাতার স্তুতি আছে এবং তাতে নিবিড় বাস্তবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এই পৃথিবীসূক্তে[4] জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও দীর্ঘস্থায়ী পরিবেশ ভাবনার চিত্র আছে। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম- পরিবেশের এই পঞ্চ মহাভূতের সংরক্ষণের কথা অথর্ববেদে বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় আধ্যায়ে পাশ্চাত্য সনাতন দর্শন ও পাশ্চাত্য ধর্মে পরিবেশের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি আলোচিত হয়েছে। বাইবেলে ঈশ্বরকে পৃথিবী, আকাশ, মানুষ প্রভৃতি সবকিছুর রচয়িতা বলা হয়েছে। তাছাড়া মানুষকে পৃথিবী, আকাশ, পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী, উদ্ভিদ ইত্যাদির উপর কর্তৃত্ব করার কথা বলা হয়েছে। পৃথিবীর সমস্ত কিছুই মানুষের ভোগের জন্য নির্মিত বলা হয়েছে। এসব থেকে বোঝা যায় বাইবেলে মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে আসীন করে এই সুন্দর পৃথিবীকে মানুষের জন্য নির্মিত বলা হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি গভীর বাস্তুতন্ত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এরূপ চিন্তাধারা পৃথিবীর সমস্ত উপাদানের ওপর মানুষের অত্যাচারকে আরো বাড়িয়ে দেবে। ইহুদি ও খ্রিষ্টধর্ম দুটি প্রখ্যাত ধর্ম। পাশ্চাত্যের জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের ক্ষেত্রে ইহুদি ও খ্রিষ্টধর্মের প্রভাব প্রসারিত।

---

[4] গোস্বামী, বিজনবিহারী (সম্পা.). (১৯৭৮). *অথর্ববেদ সংহিতা.* কলকাতা: হরফ প্রকাশনী. পৃঃ ৩০৯.

এখানেও মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে। দেকার্ত আত্মার বা মনের আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য বা গুণ হিসাবে চিন্তা করাকে (to think) বুঝিয়েছেন। এই বৈশিষ্ট্য (চিন্তা করা) যাদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়, তাদেরকেই উন্নত জীব বা মানুষের অনুরূপ বলা যেতে পারে বলে দেকার্ত মনে করেন। কিন্তু দেকার্ত যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে বিচার বুদ্ধি বা চিন্তন ক্ষমতা একমাত্র মানুষেরই আছে। উদ্ভিদ বা মনুষ্যেতর প্রাণীর (না-মানুষ) বিচার বুদ্ধি বা চিন্তন ক্ষমতা বলে বাস্তবিক পক্ষে কিছু নেই। অতএব মানুষ না-মানুষ অপেক্ষা উন্নততর জীব। লকের সম্পত্তিতত্ত্ব অনুসারে মানুষ নিজের স্বার্থে সম্পত্তি ধ্বংসের অধিকারও পায়। সম্পত্তি ধ্বংসের অধিকারের প্রসঙ্গটি পশুহত্যাকেও সমর্থন করে। নৈতিক দিক থেকে লকের সম্পত্তিতত্ত্ব আত্মবাদকে সমর্থন করে। আত্মবাদ প্রকৃতির ব্যবহারকে মানুষের শ্রমের ও ভোগের ক্ষমতাকেন্দ্রিক করে তোলে। তাই এই দৃষ্টিভঙ্গি মানবকেন্দ্রিক নৈতিকতার অনুগামী। কারণ এখানে প্রকৃতি মানুষের ভোগের উপকরণ, তার নিজস্ব মূল্য নেই। হিউম মনুষ্যেতর প্রাণীর (পশু,পাখি প্রভৃতি) বিচার শক্তির উল্লেখ করেন। পশুদের বিচার শক্তির আলোচনায় হিউম প্রথমেই বলেছেন এটি প্রতীয়মান হয় যে মানুষ যেমন অভিজ্ঞতার দ্বারা অনেক কিছু শেখে পশুরাও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অনেক কিছু শিখতে পারে।[5] মানুষের মতো মনুষ্যেতর প্রাণীরাও অনুমান করতে পারে যে একই ঘটনা ঘটলে একই ধরনের কার্য ঘটবে। এভাবে সাদৃশ্যমূলক অনুমানের ভিত্তিতে পশুরাও পাঠ্য বস্তুর বিভিন্ন ধর্মের সঙ্গে পরিচিত হয়। পশুরা তাদের জন্মের পর থেকে ধীরে ধীরে বাহ্য জগতের বিভিন্ন বস্তুর ও বস্তুধর্মের সঙ্গে যেমন জল, আগুন, মাটি, পাথর উচ্চতা গভীরতা ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিত

[5] David, Hume. (2007). *An Enquiry Concerning Human Understanding.* New York: Oxford Unversity Press. Pg- 73.

হয় এবং তাদের সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পশুদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। অভিজ্ঞ পশু যত সহজে নিজেকে বিপদ থেকে মুক্ত করতে পারে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন নয় বা কম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পশু করতে পারে না। এর কারণ হলো অভিজ্ঞ পশু সদৃশ্য অনুমান করতে যতটা সমর্থ্য, অনভিজ্ঞ পশু সদৃশ্য অনুমান করতে ততটা পটু হয়ে ওঠে না। হিউম অবশ্য বলেন পশুদের অনুমান সামর্থ্য থাকলেও সে অনুমান প্রক্রিয়ার সচেতন বা যৌক্তিক পদ্ধতির আশ্রয় নির্ভর হওয়া সম্ভব নয়। সচেতনভাবে যৌক্তিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অনুমান করা পশুদের পক্ষে অসম্ভব কারণ এর পেছনে আছে অবরোহ ও আরোহ যুক্তি। কিন্তু পশুদের অনুমানে যুক্তি বা বিচারবুদ্ধির কোন স্থান নেই। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, পশুরা বিচারশীল নয়। মানব শিশুদের অনুমান অনেক সময় বিচার বিশ্লেষণমূলক হয় না।

তৃতীয় অধ্যায়ে বাস্তুতন্ত্রের প্রেক্ষাপটে পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে 'Ecology' (বাস্তুতন্ত্র) বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। সজীব উপাদান (biotic components) এবং জড় উপাদান (abiotic components) একত্রে মিলিত হয়ে বাস্তুতন্ত্র গঠন করে। অর্থাৎ বাস্তুতন্ত্র এমন একধরনের গুরুত্বপূর্ণ একক যেখানে সজীব ও জড় বা অজীব উপাদান পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়া করে। বাস্তুতন্ত্রের সজীব উপাদানের অন্তর্গত হল মানুষ। মানুষের সঙ্গে বাস্তুতন্ত্র তথা পরিবেশের প্রতিনিয়ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটে। মানুষ ও পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে যে নীতিসূত্রগুলির উদ্ভব হয়, সেগুলি যেখানে আলোচনা করা হয় তাকে পরিবেশ নীতিশাস্ত্র (Environmental Ethics) বলে। এই অধ্যায়ে Aldo Leopold –এর 'ভূমি নীতিবিদ্যা' আলোচিত হয়েছে। Leopold মনে করেন, সংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে

অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। প্রকৃতির যে উপাদানের কোনো অর্থনৈতিক মূল্য নেই, তারা সংরক্ষণযোগ্য নয় বলে মানুষ মনে করে থাকে। কিন্তু সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী এক বৃহৎ জৈব সমাজের অংশ এবং এদের স্থায়িত্ব বা টিকে থাকা সমগ্র জীব সমাজের স্থায়িত্বের জন্য প্রয়োজন। কেবলমাত্র অর্থনৈতিক লাভ-ক্ষতির হিসাব করে যদি সংরক্ষণ নীতি নির্ধারিত হয় তবে তা আমাদের সকলের জন্য অমঙ্গলজনক। সমাজের সকল উপাদানেরই গুরুত্ব আছে বলে Leopold মনে করেন। তাই পরিবেশের যে উপাদান অর্থনৈতিকভাবে অ-লাভজনক তাকে নিয়ে চিন্তা না করে কেবল লাভজনক উপাদানকে মূল্যবান মনে করলে পরিবেশগত সমস্যার সমাধান অসম্ভব। কারণ অর্থনৈতিক দিক থেকে সমাজের যে উপাদানগুলি লাভজনক তাকে কেন্দ্র করেই সরকারের সমস্ত প্রকল্প গৃহীত হয়। তাই সমাজের সকল উপাদানের উপর মানুষকেই গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি বাস্তুতন্ত্রের গুরুত্বকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জীব পিরামিডের কথা বলেন। জমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে মানুষ অর্থনৈতিকভাবে নিজের স্বার্থের কথাই ভাবে এবং এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, যাতে মানবসমাজেরই লাভ হয় কিন্তু এমন চিন্তাভাবনা পরিবেশ তথা জমির অবক্ষয় রোধ করতে পারে না। তিনি ভূমির সঙ্গে নৈতিক সম্পর্কের কথা বলেন। যেখানে তিনি ভূমির প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা এবং প্রশংসার কথা বলেছেন। মূল্যবোধ ছাড়া ভূমিকে কখনোই রক্ষা করা যাবে না বলে তিনি মনে করেন। ভূমিকে অর্থনৈতিকভাবে বিচার না করে জনমানসে ভূমির প্রতি এক গভীর চেতনার উন্মেষ ঘটানোর দিশা তিনি দেখিয়েছেন। এই অধ্যায়ে Arne Naess দ্বারা অগভীর ও গভীর বাস্তুতন্ত্রের আলোচনা করা হয়েছে।[6] অগভীর কিন্তু বর্তমানে খুবই শক্তিশালী একটি

[6] Naess, Arne. (1973). The Shallow and Deep, Long-Range Ecology Movement. A Summary. *Inquiry*. Vol-16. Pg- 95-100.

আন্দোলন অন্যটি গভীর কিন্তু তুলনামূলক কম শক্তিশালী একটি আন্দোলন, যা আমাদের মনোযোগের দ্বারা শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে। এই দুই প্রকার আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস করেছেন Arne Naess। গভীর বাস্তুতন্ত্রের কোনো সংজ্ঞা না দিয়ে তিনি গভীর বাস্তুতন্ত্রের সমর্থনে কতগুলি নীতির উল্লেখ করেন। 'গভীর' শব্দের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করতে গেলে আমাদের গভীর ও অগভীর বাস্তুতন্ত্রের পার্থক্য আলোচনা করতে হবে। গভীর বাস্তুতন্ত্রকে কোনো নির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক আদর্শের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। জীবনের নানা দিক থেকে মানুষ গভীর বাস্তুতন্ত্রের ধারণার সঙ্গে সহমত পোষণ করেন। অন্যান্য সামাজিক আন্দোলনের মতো গভীর বাস্তুতন্ত্রের সমর্থকরাও বেশ কিছু বাণী প্রচার করেন, যা মানুষকে একত্রিত হতে সাহায্য করে। কোনো পরিবেশগত সংকট উপস্থিত হলে মানুষ যাতে স্বাভাবিক প্রতিবাদ জানায়- এমন শিক্ষা গভীর বাস্তুতন্ত্র আমাদের দিয়ে থাকে।

চতুর্থ অধ্যায়ে পরিবেশ সম্পর্কে বৌদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করা হয়েছে। বৌদ্ধধর্মে শ্রমণের গণকে যে দশশীল পালন করতে হয়, তার মধ্যে অন্যতম হল প্রাণাতিপাত-বিরতি।[7] এই শীলের অনুসরণ বৌদ্ধভিক্ষু এবং গৃহস্থ উভয়কে করতে বলা হয়েছে। কায়িকভাবে প্রাণাতিপাত থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে এবং অন্যের দ্বারা এই প্রাণাতিপাত করা, অন্যকে তা করতে সাহায্য করা বা প্রাণাতিপাতকে অনুমোদন করা থেকেও বিরত থাকতে কঠোরভাবে বলা হয়েছে। কেবল প্রাণবধ করাই যে হিংসা মনে করা হত তা নয়, দণ্ড কিংবা অস্ত্র দ্বারা আঘাত করাও হিংসা মনে হত। কোনো ব্যক্তিকে কর্কশ বাক্য বলা, অন্য কারো অনিষ্ট চিন্তা করাও হিংসা। তাই 'অহিংসা' শব্দটা

[7] ভদন্ত করুণা বংশ. (অনু.). (২০০৭). *বিনয় পিটকে পাচিত্তিয়.* বংলাদেশ: অনমদর্শী মহাস্থবির মহোদয়ের শিষ্যবৃন্দ (রাঙামাটি).পৃঃ ৯৭

বৌদ্ধ দর্শনে যথার্থ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যে শরীর, বাক্য কিংবা মন দ্বারা হিংসা করে না, যে কোনো প্রাণীকে কিঞ্চিতমাত্র পীড়া দেয় না সেই অহিংস হয়। উদ্ভিদ লতাদি বৃক্ষ এবং তাদের বীজ নাশ করাও হিংসা বলে মনে করা হত। ক্ষুদ্র বৃক্ষ, গুল্ম ইত্যাদির ক্ষতি করলে, ক্ষুদ্র প্রাণীকে বধ করলে কিংবা তাদের পীড়া দিলে হিংসা হয়। বিনয়পিটকে ব্যক্ত হয়েছে যে, প্রথমে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা সকল ঋতুতে সমানভাবে বিচরণ করত এতে জনগণ বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হয়েছিল কারণ বর্ষা ঋতুতে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বিচরনের জন্য ক্ষুদ্র বৃক্ষ, গুল্ম ইত্যাদি আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং অনেক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণী মারা যায়। এই কথা যখন বুদ্ধের সম্মুখে আসে তখন তিনি নিয়ম করেন যে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বর্ষাকালে একস্থান থেকে অন্যত্র গমন করবে না। পূর্বে বৃক্ষচ্ছেদন সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতার অভাব ছিল। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা অনেকসময়ই বৃক্ষচ্ছেদন করতেন এবং সাধারণ মানুষ এর জন্য তাদের নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম করত। তাই বুদ্ধ একদিন সকল ভক্তকে ডেকে বলেন বৃক্ষচ্ছেদন অত্যন্ত গর্হিত কাজ। বহু ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণী, একেন্দ্রিয় যুক্ত জীব এই বৃক্ষকে আশ্রয় করেই বেঁচে থাকে। বৃক্ষচ্ছেদনে অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্ন ব্যক্তিদের প্রসন্নতা বৃদ্ধি ঘটে না। পক্ষান্তরে বৃক্ষচ্ছেদন হলে অধিকতর অপ্রসন্নতা উৎপন্ন হয়, তাই বৌদ্ধভিক্ষুদের বৃক্ষচ্ছেদন না করার কঠোর বিধান গৌতম বুদ্ধ দিয়েছেন। এমনকি বুদ্ধ একথাও বলেছেন কেউ যদি ভুলবশত কোনো হিংসা করে ফেলে তবে তাকেও তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। যেমন বিনয়পিটকে বলা আছে, ভিক্ষুগণ কখনও কোনো প্রাণবান বস্তুর প্রাণ হরণ করবে না। যদি কেউ এই প্রকারের কাজ করেন তবে তাকে ধর্মানুসারে

শাস্তি ভোগ করতে হবে। তাছাড়া গো-চর্ম পরিধান না করার নির্দেশ বৌদ্ধ ধর্মে দেওয়া হয়েছে।[৪]

পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে মানুষের লোভ ও তার তথাকথিত উন্নয়নের বাসনা হলো পরিবেশগত সংকটের মূল কারণ। যেকোন তথাকথিত উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অনিবার্য পরিণতি হলো কমবেশি পরিবেশ দূষণ। যত বেশি উন্নয়নের নামে কল-কারখানার সংখ্যা বাড়বে, তত বেশি ধোঁয়া, ক্ষতিকারক গ্যাস ও শিল্পজাত বর্জ্য পদার্থে পরিবেশ দূষণ বৃদ্ধি পাবে; পাশাপাশি প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার বাড়ায় ক্রমশ তাদের অপ্রতুলতা সৃষ্টি হবে। তাহলে কি প্রকৃতিকে রক্ষা করতে গেলে উন্নয়ন বন্ধ করে দিতে হবে? কিন্তু মানুষের প্রয়োজনে তথা প্রকৃতির স্বগতমূল্য স্বীকার করে যেমন প্রকৃতির অবক্ষয় রোধ করা কর্তব্য তেমনি মানব সভ্যতার অগ্রগতি বা উন্নয়নের ধারা স্তব্ধ করে দেওয়া প্রকৃতিবিরুদ্ধ এক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি নয় কি? যেকোনো শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ এ কথা স্বীকার করবেন পরিবেশ সংরক্ষণ একান্তভাবে গুরুত্বপূর্ণ, তথাপি উন্নয়নের ধারা স্তব্ধ করে মানুষ পুনরায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের অরণ্যে ফিরে যাবে এমন আশা করাটাও চরম নির্বুদ্ধিতা। তাহলে প্রশ্নটা থেকেই গেল পরিবেশ সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন- এই দুটি ক্রিয়ার সঙ্গতি একত্রে কিভাবে সম্ভব? তাছাড়া 'উন্নয়ন' বলতে আমরা ঠিক কী বুঝি- এইসব প্রশ্নের উত্তর এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে উন্নয়নের ধারণা মূলত অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত। অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Economic Development) জাতীয় উৎপাদন ও সম্পদ বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত।

[৪] প্রজ্ঞানন্দ. (অনু.). (১৯৩৭). *বিনয়-পিটক মহাবর্গ.* কলকাতা: যোগেন্দ্র রূপসীবালা ত্রিপিটক ট্রাস্ট বোর্ড. পৃঃ ২৭০-২৭১.

অনুন্নত দেশে আর্থিক উন্নয়নকে অনেকাংশে দেখা হয় জাতীয় আয় বৃদ্ধির মাপকাঠিতে। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনও মনে করেন উন্নয়নের অর্থনৈতিক তত্ত্ব নিয়ে অনুসন্ধান ও চর্চা খুব বেশিদিন শুরু হয় নি। কিছু বছর পূর্বে অর্থনীতির একটি উপধারা হিসেবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্ম হয়। উন্নয়নের অর্থনৈতিক তত্ত্ব নিয়ে অনেক চিন্তাবিদ সংশয় প্রকাশ করেছেন। বাস্তবিকপক্ষে অর্থনৈতিক উন্নয়নতত্ত্ব অনগ্রসরতা দূরীকরণে (যা অর্থনীতির আলোচনার মূল) তেমন কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেনি। অমর্ত্য সেন যুক্তি প্রদান করে দেখিয়েছেন মানবিক উন্নয়ন ও আর্থিক সমৃদ্ধির মধ্যে যদি সাযুজ্যতার (one to one correspondence) সম্বন্ধ থাকে তবে আমাদের ব্যবহারিক দৃষ্টিতে মানুষের জীবনকে সর্বাঙ্গীনভাবে সমৃদ্ধ করা (যাকে মানবিক উন্নয়ন বলে থাকি) ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত হতে নিশ্চয়ই দেখতাম; কিন্তু যেহেতু তা আমরা দেখি না তাই আর্থিক সমৃদ্ধি কখনোই জীবনের লক্ষ্য হতে পারে না। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি কেবল মানবিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি উপায় হতে পারে।[9] সেই কারণেই অনেক দেশের স্থূল জাতীয় উৎপাদন (Gross National Product/GNP) যা আর্থিক সমৃদ্ধির সূচক, বেশি হওয়া সত্ত্বেও সেই দেশের জনগণের অকাল মৃত্যু রোধ, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, স্বাস্থ্যপরিষেবা উন্নতি করে মানুষের অসুস্থতার হ্রাস প্রভৃতি যা মানবিক উন্নয়নের মূল সোপান- তা করতে আজও ব্যর্থ হচ্ছে। ডক্টর সেনের মতে, উন্নয়ন হলো সক্ষমতা বৃদ্ধির দ্বারা জীবনের গুণগত মানের বিশ্লেষণ। মানুষের কাজের মাধ্যমেই তার সক্ষমতা বৃদ্ধি ঘটে। একটি ভালো জীবন যাপনের জন্য ব্যক্তির কাজকর্ম (functioning) করা প্রয়োজনীয়। সক্ষমতা কোন ব্যক্তির দ্বারা অর্জনযোগ্য

[9] Aristotle. (2004). *The Nicomachean Ethics.* Tredennick, Hugh (Ed.). U.S: Penguin Publishing Group. Page- 6.

ক্রিয়াকলাপের সংমিশ্রণকে বোঝায়। মানুষের উন্নয়ন বলতে সামাজিক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির দ্বারা মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার গুণগত মানের উন্নয়নকে বোঝায়। স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়ার সুযোগ, শিক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা ও অধিকার প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নতি করলে মানুষের জীবনের গুণগত মানের উন্নতি ঘটে। তাছাড়া এই অধ্যায়ের স্থিতিশীল উন্নয়নের বিভিন্ন অর্থ ও নীতিসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ব্রুটলেট কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে স্থিতিশীল উন্নয়নের ধারণা পরিবেশগত দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদিও সে গুরুত্ব অর্থনৈতিক দিক থেকেই বলে অনেকে মনে করেন। কারণ অনেকের কাছে স্থিতিশীল উন্নয়ন মূলত অর্থনৈতিক স্থিতিশীল উন্নয়নের সঙ্গে সমার্থক। পরিবেশের আলোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর অনেক নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্থিতিশীল উন্নয়নের ধারণাকে গুরুত্ব দিয়ে পরিবেশ সংরক্ষণের কথা স্মরণ করেন। জনকল্যাণমুখী অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক থেকে স্থিতিশীল উন্নয়নকে একটি বিশেষ অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন হিসাবে ধরা হয়, যা মানবকল্যাণের ন্যূনতম স্তর বজায় রাখতে সাহায্য করে। এইভাবে স্থিতিশীল উন্নয়ন কিছু প্রয়োজনীয়তার সমতুল্য হয়ে ওঠে এবং এই ভালো-হওয়া (well being) অর্থাৎ আমাদের প্রয়োজনীয়তার সমতুল্য হয়ে ওঠা বিষয়টি সময়ের সাথে কখনও আমরা হ্রাস পেতে দেখি না। স্থিতিশীল উন্নয়নের এই বৈশিষ্ট্যটি মানবকল্যাণের একটি নির্দিষ্ট ধারণা এবং সময়ের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট স্তরের মানবকল্যাণ বজায় রাখার জন্য আমাদের কী করা প্রয়োজন তা সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। এছাড়া স্থিতিশীল

উন্নয়নের সাতেরটি লক্ষ্যের কথা বলা হয়েছে যা ২০৩০ সালের মধ্যে অর্জন করার লক্ষ্য আমাদের দেওয়া হয়েছে।[10]

পরিশেষে মূল্যায়ণ ও সিদ্ধান্ত অংশে আমি পরিবেশগত সংকট দূর করতে সকল রাষ্ট্রের সমবেত প্রচেষ্টাকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনার কথা বলেছি। এর পাশাপাশি আমাদের ভারতবর্ষে পরিবেশ সুরক্ষার জন্য প্রদত্ত বিশেষ কিছু আইনের উল্লেখ করেছি। কিন্তু আমার মনে হয় এসব আইন করে পরিবেশগত সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। কারণ মানুষ কখনোই উন্নয়ন বন্ধ করে গুহাবাসী আদিম জীবনে ফিরে যাবে না বা এমনটা করাকে আমি সমর্থনও করি না। আমি কেবল বলতে চাইছি, মানবসভ্যতা যতদিন টিকে থাকবে ততদিন উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকবেই। তাই পরিবেশের অবক্ষয় রোধ করতে এবং পাশাপাশি উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে আমাদের দার্শনিক চিন্তাধারার প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে স্থিতিশীল উন্নয়নের আলোচনা আমি করেছি। আমি স্থিতিশীল উন্নয়নের প্রেক্ষিতে পরিবেশ রক্ষার বিষয়ে যুক্তির মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করেছি স্থিতিশীল উন্নয়নের মূল ভাবধারাকে বজায় রাখতে হলে পরিবেশ সংরক্ষণ কতটা জরুরী। কিন্তু এক্ষেত্রে সমস্যা হলো মানুষ স্বার্থপর জীব। তত্ত্বগতভাবে মানুষ যতই পরিবেশ সংরক্ষণ এবং স্থিতিশীল উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করুক না কেন, নিজের অর্থনৈতিক সুবিধার জন্য পরিবেশের ক্ষতি করতে বিন্দুমাত্র পিছুপা হয় না। অন্যদিকে স্থিতিশীল উন্নয়নে পরিবেশের জন্য পরিবেশকে রক্ষা করার কথা বলা হয়নি- যা কখনোই পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে কার্যকরী সিদ্ধান্ত হিসাবে গৃহীত হতে পারে না।

---

[10] Ahlawat, Ajay. (2019). *Sustainable Development Goals.* Chennai: Notion Press. pg 23-28.

এরপর বৈদিক চিন্তাধারার প্রেক্ষিতে পরিবেশরক্ষা তথা প্রাণী সংরক্ষণের বিষয়ে যে অভিমতগুলিকে পাওয়া গেছে, তার কয়েকটিকে আমি এই সিদ্ধান্ত অংশে ব্যাখ্যা করেছি। কিন্তু পরিবেশ তথা প্রাণীকে সংরক্ষণের জন্য বেদে বিভিন্ন পরিবেশ-বান্ধব চিন্তাধারা উল্লিখিত থাকলেও বৈদিক যজ্ঞে পশুহত্যার বিধি ইত্যাদি বৈদিক চিন্তার মধ্যেও পশুপাখিকে রক্ষার বিষয়ে অসংগতিকে প্রকাশ করে। তাছাড়া বেদে প্রকৃতিকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিষয়ের সঙ্গে ঈশ্বরকে জুড়ে দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনাকে ঈশ্বরের অলৌকিক শক্তি হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষিত বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনার বৈজ্ঞানিক কারণ জানেন এবং তাঁরা ঐশ্বরিক ভীতি থেকে অনেকাংশে মুক্ত। তাই প্রাকৃতিক বিষয়ের সঙ্গে ঈশ্বরকে জুড়ে প্রকৃতিকে রক্ষা করা যাবে- বৈদিক ঋষিগণের এমন চিন্তাধারা বর্তমানে একবিংশ শতাব্দীতে কতটা কার্যকরী হবে, সে প্রশ্ন থেকেই যায়।

অন্তিমে, মানুষের উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণের মধ্য একটি সামঞ্জস্য বিধানের দিশা বৌদ্ধ দর্শনের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় বলে আমি আমার অভিসন্দর্ভে দেখানোর চেষ্টা করেছি। এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধ দর্শনের দার্শনিক চিন্তার মধ্যে গভীর বাস্তুতান্ত্রিক চিন্তার ও স্থিতিশীল উন্নয়নের মূল ভাবধারার প্রতিফলন কীভাবে ঘটেছে তাও আমি এই অংশে দেখানোর চেষ্টা করেছি। বৌদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি মানুষ ও পরিবেশকে গভীরভাবে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত করতে এবং পরস্পর নির্ভরশীলতার তত্ত্বের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে চেতনার উন্মেষ ঘটাতে পারে বলে আমার মনে হয়। এই প্রসঙ্গে আমার অভিসন্দর্ভের মূল প্রশ্ন অর্থাৎ, পরিবেশের অবক্ষয় রোধ এবং মানুষের উন্নয়নের (প্রকৃত উন্নয়ন) ধারা অব্যাহত রাখা কীভাবে সম্ভব– তার উত্তর আমি বৌদ্ধ দর্শনের প্রেক্ষিতে আলোচনা করার চেষ্টা

করেছি। তাছাড়া উপরে উল্লিখিত ‘প্রকৃত’ উন্নয়ন বলতে কী বোঝায় সে সম্পর্কে পঞ্চম অধ্যায়ে আমি আলোচনা করেছি। বৌদ্ধ দর্শনের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার তত্ত্ব মেনে চললে পৃথিবী আজ এমন পরিবেশগত সংকটের সম্মুক্ষীন হত না। বৌদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষ এবং পরিবেশ গভীরতম স্তরে আন্তঃসংযুক্ত, অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত এবং পরস্পর নির্ভরশীল। তাই পরিবেশের অবক্ষয় পক্ষান্তরে মানব সমাজকেই ধ্বংসের সম্মুখীন করে- এই শিক্ষায় বৌদ্ধদর্শনই পারে মানুষের মধ্যে চেতনার উন্মেষ ঘটাতে। এর পাশাপাশি উন্নয়ন ও পরিবেশ রক্ষার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের দার্শনিক পটভূমি বৌদ্ধ দর্শন আমাদের যথার্থভাবে প্রস্তুত করে দিতে পারে বলে আমার মনে হয়।

গ্রন্থপঞ্জী

- ঘোষ, বিদ্যুৎ. বরণ. (২০১১). *সংস্কৃত-রচনায় প্রতিফলিত পরিবেশ সচেতনতা.* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার.
- চক্রবর্তী, নির্মাল্য নারায়ণ. (২০১৯). *পরিবেশ ও নীতিবিদ্যা.* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ.
- চৌধুম, সুকোমল. (সম্পা.). (১৯৯৭). *গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন.* কলকাতা: পরিবেশক প্রেস.
- চৌধুরী, মনোজিৎ আচার্য ও দাশ, অরবিন্দ কুমার ও চক্রবর্তী, পিনাকী (সম্পা.). (২০১২). *পরিবেশবিদ্যা.* বর্ধমান: আধিকারিক বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়.
- চৌধুরী, সুকোমল (অনু.). (২০১৪). *সংযুক্ত নিকায়* (তৃতীয় খণ্ড). কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি.
- চৌধুরী, হাসানুজ্জামান (অনু.). (২০১৩). *পরিবেশ ও পুঁজিবাদ.* ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ.
- ঠাকুর, পরিতোষ (সম্পা.). (১৯৭৫). *সামবেদ সংহিতা.* কলকাতা: হরফ প্রকাশনী.
- ঠাকুর, পরিতোষ. (অনু. ও সম্পা.). (১৩৮৫ বং). *সামবেদ সংহিতা.* কলকাতা: হরফ প্রকাশনী.
- দত্ত, রমেশচন্দ্র ও বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরন্ময়. (১৩৮৫ বং). *ঋগ্বেদ সংহিতা* (দ্বিতীয় খন্ড). কলকাতা: হরফ প্রকাশনী.

- দত্ত, রমেশচন্দ্র (অনু.). (১৯৭৮). *ঋগ্বেদ সংহিতা* (দ্বিতীয় খণ্ড). কলকাতা: হরফ প্রকাশনী.

- Ahlawat, Ajay. (2019). *Sustainable Development Goals*. Chennai: Notion Press.

- Descartes, Rene. (2006). *A Discourse on the Method.* Maclean, Ian (trans.). New York: Oxford University Press.

- Ernst Haeckel, *History of Ecological Science*, part 47: Ernst Haeckel's Ecology, Bulletin of the Ecological Society of America, July, 2013

- Sen, Amartya. (1983). Development: Which Way Now?. *The Economic Journal*. Vol-93. Issue-372. December. Page- 745-762.

- Sen, Amartya. (2001). *Development as freedom*. Oxford: OUP Oxford.

- Sharma. N. (2015). *Environmental awareness at the time of Vedas*. *Ved-Vidya*, 26(4), 221-224.

- Zondervan (Ed.). (2013). *Holy Bible*. United States: Zondervan.